তৃতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক আলোচনা-গবেষণা চর্চা ঃ ১৯৮১-১৯৯০

রবীন্দ্রসঙ্গীতের আলোচনা, সমালোচনা ও গবেষণার চর্চা রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষের পরবর্তীসময়ে যথেষ্ট বিস্তার লাভ করে। এ বিষয়ে প্রকাশিত অসংখ্য গ্রন্থই এর সাক্ষী। ১৯৮১ থেকে ১৯৯০ এই দশকে প্রকাশিত রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক আলোচনা গ্রন্থের মধ্যে আমাদের সমীক্ষায় নির্বাচিত গ্রন্থের রচয়িতারা হলেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশেষজ্ঞ আচার্য, রবীন্দ্র সান্নিধ্যধন্য ব্যক্তিত্ব, রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ও শিক্ষক তথা তাত্ত্বিক ব্যক্তিত্ব। তাঁদের এই সময়কালে প্রকাশিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের গবেষণা গ্রন্থগুলি এই সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিশিষ্টজনের রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক আলোচনায় ধরা দিয়েছে রবীন্দ্রনাথের গানের বহুমাত্রিক দিক, যা বিশ্বকবির গানের ভুবনের মধ্যে নতুন করে তাঁকে জানা বা বোঝার সুযোগ করে দিয়েছে আমাদের সকলকে।

।। এক।।

সন্‌জীদা খাতুন্‌-এর 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাবসম্পদ' গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ঢাকায় ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে। আলোচক জানিয়েছেন গ্রন্থটি ১৯৭৫-৭৬ সালে

বিশ্বভারতীর পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য লেখা। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে এই গ্রন্থের একটি সংক্ষেপিত সংস্করণ 'অধরা মাধুরীর ছন্দোবন্ধন' নামে 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ' কর্তৃক প্রকাশিত হয়। আমাদের সংগৃহীত গ্রন্থটি মূল গ্রন্থের তৃতীয়সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ। প্রকাশিত হয় ঢাকায় ২০০৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে।

গ্রন্থের সূচিতে রয়েছে—উপক্রমণিকা, রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাবসম্পদ, বাণীপ্রধান গান, সুরপ্রধান গান, ছন্দপ্রধান গান, গ্রন্থপঞ্জী, নির্দেশিকা। ১৯২ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে সনজীদা রবীন্দ্রসঙ্গীতের উদাহরণ সাজিয়ে যুক্তি শৃঙ্খলার পারম্পর্যে বিশ্লেষণ করেছেন প্রতিটি প্রবন্ধ। বাণীপ্রধান, সুরপ্রধান ও ছন্দপ্রধান এই তিনটি ভাগে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে বিভক্ত করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাবসম্পদ খুঁজেছেন আলোচক খাতুন্। রবীন্দ্রসঙ্গীতের বাণী প্রধান, সুর প্রধান ও ছন্দপ্রধান গানের ভাবসম্পদ অন্বেষনের মধ্যে গবেষক প্রত্যক্ষ করেছেন এক ধারার সাথে অন্য ধারার সম্পৃক্ততার দিক। গীতবিতানের বিষয় বিভাগের মতোই এই বিভাগগুলিও যেন তাঁর কাছে সন্তোষজনক নয়। তাঁর মতে, বাণী কখনো কখনো ভাব প্রকাশের ভারটুকু বইতে না পেরে সুর ও ছন্দের কাছে যেন আত্মসমর্পণ করেছে। তিনি লিখেছেন,

> ''রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাবসম্পদ গানের কাব্য অংশে প্রকাশিত সৌন্দর্যটুকু নয়, সুরে বাণীতে ছন্দে গানের যে সম্পূর্ণ প্রকাশ, তার অখণ্ড সৌন্দর্য। ...সঙ্গীত ধ্বনিময় শিল্প। এই কারণে ধ্বনিশিল্প হিসাবে এই সৃষ্টি চিত্তে যে রসোদ্রেক করে, যে ভাবের ঐশ্বর্য রচনা করে তার আলোচনাই বাস্তবিক সঙ্গীতের ভাবসম্পদের আলোচনা।''[১]

গবেষক সনজীদা খাতুন গভীর অন্বেষণের মধ্যদিয়ে বাণী, সুরও ছন্দের ত্রিবর্ণে রঞ্জিত রবীন্দ্রসঙ্গীতকে উপস্থাপিত করেছেন।

কিরণশশী দে লিখিত ‘রবীন্দ্রসঙ্গীত ঃ রবীন্দ্রনাথ ও শিক্ষক দিনেন্দ্র নাথ’ গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে। যদিও আমাদের সমীক্ষায় বিশ্লেষিত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ২০০০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। গ্রন্থের ভূমিকা থেকে জানা যায় যে এই গ্রন্থের স্মৃতিকথনের এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়েরও কোন কোন অংশ আনন্দবাজার পত্রিকা, দেশ, অমৃত, রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ, রবীন্দ্রভাবনা, জনসেবক, সুরছন্দা, সুরের মায়া, সমতট, দরোজা, মাসিক ও দৈনিক বসুমতী ইত্যাদি পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। সেই লেখাগুলিই পরবর্তীকালে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত করে আলোচনা গ্রন্থে সংযোজিত করেছেন লেখক। স্মৃতিচারণার ভঙ্গিতে লেখা এই গ্রন্থে লেখকের রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ও শিক্ষক হয়ে ওঠার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। লেখকের সঙ্গীতশিক্ষার বর্ণিল অভিজ্ঞতার মধ্যে সেসময়কার বাংলাদেশের সঙ্গীতজীবন এবং রবীন্দ্রনাথের গানের মাধ্যমে বাংলাগানের সমৃদ্ধ হবার কথাও উঠে এসেছে। বিংশ শতকের প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথের গানের বাংলাদেশে জনপ্রিয়তার নিদর্শন রাখতে গিয়ে বেশ কিছু গ্রামাফোন রেকর্ডের উল্লেখও করেছেন। তখন ঐ রেকর্ডগুলিতে রবীন্দ্রনাথের নামোল্লেখ থাকতো না। শিল্পীরাও রবীন্দ্রনাথের কথা ও সুরের প্রকাশ ঘটাতে নিজস্ব জ্ঞান ও শিক্ষার ফলে অনেকটাই নিজের মতন করে গাইতেন। এ সমস্ত তথ্য ধরা পড়ে লেখকের লেখনীতে। স্বল্প পরিসরের লেখনীতে লেখক শিক্ষক দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গীত শিক্ষাদানের বৈশিষ্ট্যের আলোচনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের গানের ভাণ্ডারীর মূল্যায়ন করেছেন। ‘গান গাওয়ানো’ ও ‘গান শেখানো’ এই দুই এর পার্থক্য বুঝিয়ে দিনেন্দ্রনাথের ছাত্র কিরণশশী নিজের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনি বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের গানের শিক্ষায় স্বরলিপির আবশ্যকতার দিকটিতে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। লেখক শান্তিনিকেতনে তাঁর অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গে বলেছেন—

> ‘‘ইতিপূর্বে আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত বাইরে বেশ ভাল রবীন্দ্রভক্ত নিষ্ঠাবান গায়ক গায়িকাদেরই কণ্ঠে শুনে এসেছিলাম, তবে এবার শান্তিনিকেতনের গাওয়ার সঙ্গে বাইরের গাওয়ার পার্থক্য অনুধাবন করতে গিয়ে ক্রমশ বুঝতে পারছিলাম, আসলে এখানকার সাংস্কৃতিক আবেষ্টনটাই অন্য রকমের, যার জন্যে সঙ্গীতানুশীলনের আদর্শের মধ্যেও আছে কোনো এক অনির্বচনীয় বৈশিষ্ট্য এবং শান্তিনিকেতনের গায়ক গায়িকাদের কণ্ঠে যেন তাঁদের অজানিতেই সেই বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ উৎসারিত হয়ে চলেছে দিনরাত—অত্যন্ত সহজ সাবলীল গতিতে কেবলমাত্র কবিগুরুর বিরাট ব্যক্তিত্বপূর্ণ প্রভাবের স্নিগ্ধতায়, আর তার পিছনে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় একাত্মরূপে মিশে আছে তাঁর সকল গানের ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথের স্বার্থহীন সক্রিয় উদ্যম।’’[২]

শিক্ষক দিনেন্দ্রনাথ সম্পর্কে লেখকের বক্তব্যের মধ্যে ফুটে উঠেছে দিনেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব সহ শিক্ষণ পদ্ধতির কথা। লেখক বলেন,

> ‘‘... কোনো রকমের বাহ্যাড়ম্বর নেই তাঁর। তবু তাঁর ব্যক্তিত্বপূর্ণ বিশিষ্টতা সেখানকার আবহাওয়ার মধ্যে এক সুস্পষ্ট সম্ভ্রম জাগিয়ে তুলছে। ধারে কাছে সঙ্গতের জন্যে নেই একটা সামান্য বাদ্যযন্ত্রও! অথচ স্বতঃস্ফূর্তভাবে গান গেয়ে চলেছেন তিনি খালি গলায়! ... ব্যাপারটা টেক্‌নিক্ ঘেঁষা এবং বেশ দুরূহ... এই দুরূহ একঘেয়ে কাজেতেই দিনেন্দ্রনাথের কত আনন্দ। ... দিনেন্দ্রনাথের কাছে সকল রকমের শিক্ষার্থীরা নির্বিচারে সমাদর পেতেন...’’[৩]

বেশিরভাগ স্মৃতি কথনের মাধ্যমে উঠে আসা বিষয়কে এই গ্রন্থে উপস্থাপিত করে লেখক রবীন্দ্রসঙ্গীতে গুরুশিষ্য পরম্পরায় যথার্থ ভাবে শিক্ষণ ও শিক্ষকের দায়িত্ব সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন।

।। দুই।।

অরুণ ভট্টাচার্যের 'রবীন্দ্রগানের মুক্তধারা' গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে। সংগৃহীত গ্রন্থটি জানুয়ারি ২০১১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত সংস্করণ। গ্রন্থসূচিতে রয়েছে-১ কথা, সুর, কথা ও সুরের অর্ধনারীশ্বর রূপ। ২. রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতচিন্তা, সঙ্গীতসৃষ্টি ঞ্ব রহস্যের অন্তরালে, শিল্পদর্শন ও সুন্দরের প্রশ্ন, ভারতীয় রাগরাগিনীর প্রানৈশ্বর্য। ৩. বাঙালীর গান এবং রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রসঙ্গীতের আপন জগৎ, রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশ্লেষণের নতুন পদ্ধতি ও বিন্যাস, রবীন্দ্রসঙ্গীতে গণতাৎপর্য। পরিশিষ্ট উল্লেখিত ১১২টি গান।

গ্রন্থটিতে রয়েছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের নান্দনিক বিশ্লেষণ। তিনটি পর্বে বিভক্ত আলোচনার প্রথম পর্বে লেখক রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথা ও সুরের বিশ্লেষণের মধ্যে আলোকিত করেছেন কীভাবে কবি তাঁর বিচিত্রধর্মী সৃষ্টিধারায় নিজেকে নিজেই অতিক্রম করেছেন, কীভাবে তাঁর গানে স্বর থেকে সঙ্গতিতে পৌঁছেছেন, আর কথার সামান্যকরণ থেকে সুরের অসামান্যতায় নন্দনতত্ত্বের পথ ধরে সঙ্গীত সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মতে বাণী-সুর ছন্দের ঊর্দ্ধে এক বিশেষ ব্যঞ্জনা সেই পরিপূর্ণতাকে অবয়ব দিয়েছে, যার ফলে সমস্ত সৃষ্টি অনন্য হয়ে উঠেছে। লেখক গীতবিতানের পর্যায় বিভাগকেও উপরিভাগে বিভক্ত করেছেন তাঁর আলোচনায়। যেমন—'স্বদেশ'

পর্যায়ে দেশপ্রেম, শক্তির উদ্বোধন, আশা ও জয়যাত্রা, স্বদেশের রূপবর্ণনা, নবীনের আবাহান। প্রেম পর্যায়ে— সঙ্গীত প্রেম, প্রকৃতিপ্রেম, ঈশ্বরপ্রেম, বিশ্বমানবের প্রেম।

শ্রী ভট্টাচার্যের মতে রবীন্দ্রনাথ মূলত রাগের রঞ্জকতার গুণকে প্রাধান্য দিয়ে তাঁর গানে তা প্রয়োগ করেছেন, তাই রবীন্দ্রসঙ্গীতে রাগমিশ্রণ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে ওঠে এ কেবলই 'গান'। লেখক আলোচনার দ্বিতীয় পর্বে সঙ্গীত বিষয়ে রবীন্দ্রচিন্তাধারাকে একীভূত করে রবীন্দ্রমননে সঙ্গীতের অবস্থান সম্পর্কে বুঝিয়েছেন। নান্দনিক আলোচনায় তিনি বলেছেন 'সঙ্গীত' হচ্ছে মানব মনের আনন্দরূপ, রবীন্দ্রনাথ আনন্দকে 'সহজ' বলেছেন। লেখকের মতে, রবীন্দ্রনাথ আনন্দের এই সহজিয়া ভাবটি তাঁর গানের ভিতর দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। ব্যাকরণকে একপাশে সরিয়ে রেখে তার আনন্দ স্বরূপকেই কবি উপলব্ধি করেছেন। এই নান্দনিক আলোচনায় উঠে এসেছে রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুন্দরের পদচারণার কথা। লেখকের মতে কবির মধ্য থেকে শেষ জীবনের গানে এই সৌন্দর্যবোধ অতি সহজভাবে ফুটে উঠেছে। রুচি, পরিমিতি আর সংযমবোধের সুমিত প্রকাশে স্রষ্টা পৌঁছে যান সুন্দরের কাছে—যা রবীন্দ্রসঙ্গীতকে অনুপম করে তুলেছে। লেখকের মতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের ভাব সৌন্দর্যকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই গ্রন্থে লেখকের তৃতীয় পর্বের আলোচনায় নিরূপিত হয়েছে ভারতীয় সঙ্গীতে কথা, সুর ও ভাবের ঐশ্বর্যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিক অবস্থানের কথা। রবীন্দ্রসঙ্গীতের আলোচনার ইতিহাসে কবি, গায়ক, অধ্যাপক ও গবেষক অরুণ ভট্টাচার্যের এই গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রসঙ্গীতানুরাগীদের চিন্তাচর্চাকে ঋদ্ধ করবে।

।। তিন।।

সুচিত্রা মিত্র-র 'রবীন্দ্রসঙ্গীত জিজ্ঞাসা' (রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ে কিছু ভাবনা চিন্তা ও নিবন্ধিকা) গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে। আমাদের সংগৃহীত গ্রন্থটি ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ। স্বল্পায়তন ৯৫ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থের সূচিতে রয়েছে— রবীন্দ্রসঙ্গীতে কথা ও সুরের যুগলমিলন, রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুর, রবীন্দ্রসঙ্গীতে তাল ও লয়, রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কী ও ঢঙ, রবীন্দ্রসঙ্গীত ঙ্ম নাট্য প্রয়োগে, রবীন্দ্রসঙ্গীত ঙ্ম জীবন, শিক্ষায় ও সাধনায়, রবীন্দ্রগীতিনাট্যের প্রযোজনা ঙ্ম তাসের দেশ, রবীন্দ্রসঙ্গীত ঙ্ম কিছু স্মৃতি, শেষ নাহি যে—এই কয়টি নিবন্ধ।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রখ্যাত শিল্পী, শিক্ষিকা 'সুচিত্রা মিত্র' নিজেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি প্রতিষ্ঠান বললে অত্যুক্তি হবে না। শ্রদ্ধেয়া মিত্রের দীর্ঘ অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনে তিনি গান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য সহ তাঁর গানের নানাদিক নিয়ে সমৃদ্ধ আলোচনায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি স্বচ্ছ ধারণার আকল্প গড়ে তুলেছেন আমাদের সামনে। আবার তাঁর নিজস্ব শিল্পীজীবনের কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলে শিল্পী রবীন্দ্রনাথকে যেমন শ্রদ্ধা জানিয়েছেন আর অন্যদিকে আমাদেরকেও শিক্ষিত করেছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরের আলোচনায় সুচিত্রা মিত্র বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের সঙ্গীত রচনাতেই ধ্রুপদের মূলতত্ত্বটি ছড়িয়ে আছে। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রাণলোকটি কবি প্রকৃতিতে প্রতিফলিত হয়েছিল বলেই রবীন্দ্রনাথের গান ভারতীয় সঙ্গীতের পাশে স্বমহিমায় বিরাজিত। বাংলা লোকগীতির উপেক্ষিত সুর-ছন্দ, বিদেশি সুরের বৈচিত্র্য ও ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের বিস্তার—এই তিন উপাদানের

সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথ এমন এক গীতিরীতির সৃষ্টি করেছেন, যা বিশেষভাবে তাঁর নিজস্ব ভাবপ্রকাশে সমর্থ। এই সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সুচিত্রা মিত্র বলেছেন,

> ‘‘অনেক কিছুর স্বীকরণে তাঁর সঙ্গীত এক অনন্যরূপ নিয়েছে যে তাতে কোন বিশেষ উপাদানের স্বতন্ত্ররূপের অস্তিত্ব আর থাকে না। এখানেই তাঁর সার্বভৌমত্ব ও অসামান্যতা।’’[৪]

রবীন্দ্রসঙ্গীতে তাল ও লয় নিয়ে আলোচনায় তিনি বলেছেন

> ‘‘তাঁর সঙ্গীতের মাঝখানে আসন জুড়ে বসেছে কথা বটে, কিন্তু তার একদিকে সুর আর একদিকে তাল ও লয়—একই সঙ্গে ঘনিষ্ট ও দূরবর্তী। ... তারা অতিরিক্ত নয়, আবার অবান্তরও নয়। অর্থাৎ গানের বক্তব্যটি ছাড়িয়ে তাল লয় কখনোই মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়নি। ... আমার মতে, কথা, সুর, তাল ও লয়ের সার্থক সংমিশ্রণে রবীন্দ্রনাথের সব গানই এক আশ্চর্য নাটকীয়তা আর ডাইমেনশান লাভ করেছে। তাঁর গানের ভাবরূপটির প্রকাশে এবং চিত্রকল্প রূপায়ণে এই চারটি বস্তুর প্রয়োজন আছে।’’[৫]

একাধিক তাল ব্যবহৃত ছন্দান্তরের কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীতের উদাহরণ আর বিশেষ করে ‘চণ্ডালিকা’ নৃত্যনাট্যের গানের উদাহরণ দিয়ে বিশ্লেষণ করে গবেষক তাঁর মতামতকে যথাযথ প্রতিপন্ন করেছেন। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রসঙ্গীত আলোচনায় শিল্পী ও গবেষক সন্‌জীদা খাতুন এর ‘রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাবসম্পদ’এর ভাবনার সাথে সুচিত্রা মিত্রের ভাবনার মিল বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো। এই গ্রন্থে রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কী ও ঢঙ নিয়ে গবেষকের মতামত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ‘গায়কী’ বলতে তিনি বুঝিয়েছেন, গায়কী হচ্ছে একটি ঐতিহ্য। বহুদিন ধরে একটি বিশেষ গায়নরীতির

ফলে সঙ্গীতের যে রূপ বা রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়—তা-ই গায়কী। যেমন ধ্রুপদ, খেয়াল ইত্যাদি গাইলে কোনটা কী বুঝতে আমাদের অসুবিধে হয় না। ঠিক যেমনি ভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন সুরকার, গীতিকারের রচনাকে চিন্‌তে পারা যায় তাঁদের রচনাভঙ্গি, সুর সংযোজনার বৈশিষ্ট্যে—গায়কীর জন্য। শ্রদ্ধেয় গবেষক 'গায়কী' আর 'ঢঙ' এর মধ্যে তফাৎ করেছেন সুন্দরভাবে। তাঁর মতে 'ঢঙ' সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। তাই ব্যক্তিবিষয়ে 'ঢঙ' হবে ভিন্ন, কিন্তু বিশেষ কোন ধরনের সঙ্গীতের 'গায়কী' কখনও পাল্টাবে না। তাই যে কোন সঙ্গীতেরই 'গায়কী' বজায় রেখে গায়ক বা গায়িকা তার নিজস্ব 'ঢঙ' এ গাইবেন এটাই কাম্য। রবীন্দ্রসঙ্গীতের 'গায়কী' আয়ত্ত করতে গেলে সঙ্গীত চর্চার পাশাপাশি রবীন্দ্র জীবন-দর্শন-সাহিত্য বিষয়েও জ্ঞান থাকা দরকার। তিনি বলেন যে নিখুঁতভাবে স্বরলিপির অনুসরণ করলেই চলবে না, স্বরলিপির কাঠামো বজায় রেখে যথাযথ প্রাণ প্রতিষ্ঠাই হবে সার্থক রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীর কর্তব্য। রবীন্দ্রনাথের গানকে আরও উন্নীতকরণের অপচেষ্টাকেও তিনি নিন্দা করেছেন। যা ইদানীং রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চায়ও পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রসঙ্গীতে শিল্পীরা স্বাধীনতা নিশ্চয়ই উপভোগ করতে পারবেন, যদি কি না তারা সঠিক চর্চায় রবীন্দ্রগানের মর্মে পৌঁছতে পারেন।

আলোচক রবীন্দ্রসঙ্গীতের শ্রোতার রুচির মানও যাতে উন্নত হয়, সে দিকেও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে সবসময় শ্রোতার রুচিতে গান পরিবেশিত হবে না, আর এক্ষেত্রে রুচিবান শিল্পীরই দায়িত্ব বেশি। শিল্পী ও শ্রোতার রুচির মান যখন সমস্তরে আসবে সেদিনই সঙ্গীত পরিবেশনা সার্থক হবে, আর শিল্পীও যথার্থ স্বাধীনতার রসাস্বাদন করতে পারবেন। রবীন্দ্রনাথের নাট্যসঙ্গীতের আলোচনায় সুচিত্রা মিত্র বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথ নাটকের প্রয়োজন ছাড়াও তাঁর পূর্ব রচিত বহু গানকে পরবর্তী নাটকে ব্যবহার করেছেন। এই আলোচনায় গীতিনাট্য,

নৃত্যনাট্য, কাব্যনাট্য ও গীতিবহুল ঋতুনাট্যকে সরিয়ে রেখে 'শারদোৎসব' নাটক থেকে শুরু করে পরপর নয়টি নাটক সহ 'তাসের দেশ' নাটকের গানকে চরিত্রগত দিক থেকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন—ঋতুসঙ্গীত, ওয়ার্কসঙ্ বা কর্মসঙ্গীত, সমবেত কণ্ঠের গান যা নাটকের কোনো 'মোটিফ'কে স্পষ্ট করে আর থীম সঙ্ যাতে নাটকের বিষয়বস্তু, প্রচার্য তত্ত্ব, নাটকের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য প্রকাশ পায়। তাঁর এই উপবিভাজিত নাট্যসঙ্গীত আমাদের রবীন্দ্রসঙ্গীত উপস্থাপনে নানা উপলব্ধি আর প্রয়োজনের সমাধান দেয়। রবীন্দ্রসঙ্গীতের আলোচনায় সুচিত্রা মিত্র-র যুক্তিনিষ্ঠ সমৃদ্ধ আলোচনা গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চায় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, সন্দেহ নেই।

।। চার।।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'আলো-আঁধারের সেতু ঃ রবীন্দ্র চিত্রকল্প' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে। আলোচ্য গ্রন্থের সূচিপত্রে আলোচিত বিষয় হল—রবীন্দ্র গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের চিত্রকল্প, রবীন্দ্র গীতির চিত্রকল্পের পৃথক বিচারের প্রয়োজন, একটি ঈশ্বরের জন্ম, রবীন্দ্রগীতির চিত্রকল্প প্রসঙ্গ, রবীন্দ্র গীতিবাণীর চিত্রকল্প প্রকৃতি, আধুনিক মন ও রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান, সান্ধ্যরবিচ্ছায়া। লেখক এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলির মাধ্যমে কবির সৃষ্টির মধ্যে চিত্রকল্পকে লক্ষ করেছেন।

লেখকের মতে দেখা, শোনা আর মননশীলতায় কবির কাছে যা-ই মূর্ত হয়েছে, যে ভাবে ধরা দিয়েছে, তার রূপায়ণ পদ্ধতি যাইহোক না কেন, তা যেন 'চিত্রকল্প'। কবির সৃষ্টিতে এভাবে ছবি ফুটে উঠেছে বিচিত্রভাবে। এই গ্রন্থে লেখক

মূলত কবির আটচল্লিশ থেকে তিয়াত্তর বছর বয়স পর্যন্ত রচিত গানগুলির মধ্যে গানের কবিতায় চিত্রকল্পের অনুসন্ধান করেছেন। 'রবীন্দ্র গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের চিত্রকল্প' প্রবন্ধে লেখক বলেছেন যে রবীন্দ্রগীতির চিত্রকল্পের সঙ্গে গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের চিত্রকল্পের স্বভাবগত অমিল রয়েছে। গীতিনাট্যে রবীন্দ্রনাথ নাট্য ভূমিসম্মত চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন, যেমন বাল্মীকির অন্তঃসংঘাতে। আবার নৃত্যনাট্যের বাণীতে রয়েছে চিত্রকল্পের অন্তর্গূঢ় বাঁধন, যেমন চিত্রাঙ্গদার নিজত্বের অনুসন্ধান ও অর্জুনের নিজেকে খুঁজে ফেরার উপলব্ধিতে সূর্য বা আলোর প্রকাশের ছবি ব্যবহৃত হয়েছে, চণ্ডালিকাতে নাগ ও কামনাকে কেন্দ্রে রেখে আলো ও অন্ধকারের দ্বন্দ্ব প্রধান চিত্রকল্প, শ্যামাতে 'ক্রয়বিক্রয়' 'লাভ ক্ষতি', 'পণ' ইত্যাদি চিত্রকল্প চিত্রায়িত হয়েছে। 'একটি ঈশ্বরের জন্ম' প্রবন্ধে লেখক বলেন যে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত 'রাজা' বা 'নাথ', 'স্বামী' ও 'প্রভু' সম্বোধনগুলি পৃথক পৃথক অনুষঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে রবীন্দ্রসঙ্গীতে।

১৯১০ থেকে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের রবীন্দ্রজীবনে পর্বান্তরের পটভূমিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের চিত্রকল্পে আঁকা রয়েছে ক্লান্তির অবসান ও নতুন প্রত্যয়ের দিকে যাবার ইঙ্গিত। 'রবীন্দ্র-গীতির চিত্রকল্প প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে লেখক বলেন যে 'গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য গীতালি' এই তিনটি গীতিকাব্যের গানে রয়েছে বিরহজনিত প্রতীক্ষা। লেখক লক্ষ করেন যে কবির পূজার গানের সংখ্যাধিক্য বাহান্ন তিপান্ন বছর বয়সেই। লেখক রবীন্দ্রনাথের প্রেম পর্যায়ের গানে আধুনিকতার আভাস পেয়ে বলেন যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের প্রেমের গানে অচরিতার্থ প্রেমের বেদনা প্রকাশিত। প্রেমের গানে নারী চরিত্র রাধার উত্তরাধিকার, পুরুষ চরিত্রের গানগুলিতে তার প্রেম সেই পরিমাণে হৃদয়দ্রাবী, যে পরিমাণে তা বেদনাময়। লেখকের মতে ১৯০৯ এর আগে রচিত প্রেমের গানে রবীন্দ্রনাথ কালজয়ী। কিন্তু ঐ সময়কার প্রেমের গান

প্রেমিক বা প্রেমিকার বেদনার গান রূপে প্রতিষ্ঠিত। লেখক লক্ষ্য করেন প্রেমের গানে পথ ও পথিকের প্রসঙ্গও এসে ধরা দেয়। লেখকের মতে রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান কেবল দুঃখ বা আনন্দের গান নয়, তা গভীর উপলব্ধির গান, আবার প্রেমের গানের আবেগের সঙ্গে অধ্যাত্মচেতনা বা পূজা ভাবের কোনো কোনো গানের অতীন্দ্রিয় চেতনার আলোক যে বিচিত্র বাতাবরণ সৃষ্টি করে, তার স্বাদ আলাদা। তাঁর মতে পূজার গান আর প্রেমের গান কাছাকাছি এসে জড়িয়ে গেছে পরস্পরের সঙ্গে, যেখানে প্রেম, প্রকৃতি ও ঈশ্বর একাকার হয়ে ধরা দিয়েছে। এই গ্রন্থের নানা ভাবনায় উঠে এসেছে মুক্তি আর মৃত্যু প্রসঙ্গ। লেখকের মতে, রবীন্দ্রনাথের কবি কল্পনার মুক্তি ঘটেছে 'ক্ষণিকা' থেকে। এই মুক্তি রবীন্দ্রনাথের কাছে সার্থকতা লাভ করেছিল 'বলাকা' 'পূরবীর' সময় থেকে। এছাড়া 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যের 'মরীচিকা', 'কুয়াশা', 'সংশয় আঁধারে', 'কুহক লেখনী' প্রভৃতি অনুষঙ্গ সমেত চিত্রকল্পগুলি কবির মুক্তিচেতনার ইঙ্গিতবাহী।

লেখক লক্ষ করেন যে ১৮৯০ থেকে ১৯১০ এর মধ্যে রবীন্দ্রগানে রাজা, প্রভু বা নৃপতির দেখা পাওয়া যায়। লেখক রবীন্দ্রনাথের এই 'রাজা' কল্পনাকে এক বিকল্প রাজার সন্ধান বলে মনে করেন, যে রাজা মুক্তি দেয় অন্তত মনের দিক থেকে। লেখকের দৃষ্টিতে কবির আটচল্লিশ থেকে বাহান্ন এই পাঁচ বছরে রচিত বর্ষার গান সংস্কৃত কাব্য, বৈষ্ণবপদ, বাংলাগানের অনুষঙ্গ থেকে মুক্ত হয়েছে উদ্দীপনার ভাষায়। লেখক প্রত্যক্ষ করেন যে 'পথিক মেঘের দল জোটে ওই শ্রাবণ গগন অঙ্গনে' এবং 'ওরে ঝড় নেমে আয়' এই সমস্ত গানগুলি শুধুমাত্র বিরহের অনুষঙ্গবাহী নয়, গানগুলি মুক্তির প্রতীক। লেখক মনে করেন যে ব্যক্তিজীবনে সত্তা যখন বন্ধন থেকে মুক্তি চাইবে তখন রবীন্দ্রনাথের এই গানগুলি স্বাধীনতা পিপাসু মানুষের জীবনে গান হয়ে ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হবে। মুক্তিপ্রয়াসী রবীন্দ্রনাথের

চিত্র সাধনার সঙ্গে রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যগুলির আত্মীয়তা খুঁজে পান লেখক। তাঁর অভিমত হলো, তিনটি নৃত্যনাট্যের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ মুক্তির রেখাপাত ঘটিয়েছেন নৃত্যনাট্যের বক্তব্যে আর আঙ্গিক প্রয়োগে। সমালোচকের মতে অমেয় জীবনপ্রেম কবিকে জীবনের সঙ্গে বিচ্ছেদের চিন্তায় বারে বারে আকুল করে তুলেছিল। পৃথিবীতে এসে ভালাবাসা সত্ত্বেও যে একদিন বিদায় নিতে হবে, এটা কবির কাছে বিশেষ বেদনার কারণ ছিল। 'মধুর তোমার শেষ যে না পাই'-এই আনন্দ বার্তা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে 'প্রহর হল শেষ' এই মৃত্যুচেতনাও কবিকে একই সঙ্গে স্পর্শ করেছে। 'পূরবী'র কাল থেকেই এই প্রহর শেষের বার্তা তীব্র হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি কাব্য-নাটক-গান-গীতিনাট্য-উপন্যাস ও ছবির মধ্য দিয়ে নৃত্যনাট্যতে এসে কীভাবে সঠিক শিল্পভাবনার চূড়ান্তে পৌঁছাল, তার খুঁটিনাটী পর্যালোচনা করেছেন লেখক। বিভিন্ন নিবন্ধে রবীন্দ্রসঙ্গীতের চিত্রকল্পের সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে লেখক রবীন্দ্রনাথের এই চিত্রীসত্তারও পরিচয় তুলে ধরেছেন। সমালোচকের ভাষায়,

> ''কবিতাই তাঁর স্বভূমি। তবু কবিতায় সব বলা যাচ্ছে না—এই বোধ থেকেই তাঁর ছবি। এই বোধ থেকেই প্রথমাবধি নিত্য সঙ্গী ছিল তাঁর গান। তাঁর গানের জগৎ বা ছবির জগত তাঁর কবিতার জগতের সম্প্রসারণ নয়, বরং 'সম্পূরক'। সব মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ।''[৬]

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের গানকে নতুন করে ভাবতে আমাদের সাহায্য করবে। অতি নান্দনিক ব্যাখ্যায় সমৃদ্ধ গ্রন্থটি রবীন্দ্রগানের ভাবজগতের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটায় চিত্রকল্পের বর্ণালীছটায়।

।।পাঁচ।।

সুধীর চক্রবর্তী লিখিত 'গানের লীলার সেই কিনারে' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে। গ্রন্থটির সূচিতে রয়েছে—সমকালীন গীতিকার ও রবীন্দ্রনাথ ঃ বৃক্ষ ও বনস্পতি, গানের দুই রাজা ঃ রবীন্দ্রনাথ, রবার্ট বর্ন্‌স্‌, রবীন্দ্রসঙ্গীত ঃ বাংলা গানের সর্বনাশ ও সর্বস্ব, কবিতা আর গানের আকাশ ঃ রবীন্দ্রনাথ, গানে ছবির প্রেরণা ও রবীন্দ্রনাথ, দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া, কোন্‌ ভাঙনের পথে এলে, বাংলা নাটকের গান, রবীন্দ্রনাটকের গান। পায়ে চলার শিল্পে বাক্যের শিল্প, রবীন্দ্রসঙ্গীতে কীর্তনের প্রভাব।

গ্রন্থটিতে লেখকের 'আত্মপক্ষ থেকে জানা যায় যে, গ্রন্থভুক্ত উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল 'দেশ', 'বারোমাস', 'উত্তরসূরি', 'গন্ধর্ব', 'প্রমা', 'আজকাল' ইত্যাদি পত্রপত্রিকায়। লেখকের মতে গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের গানের লীলা অর্থাৎ সঙ্গীত সৃষ্টির জগত সম্বন্ধে জানা ও জানানোর ইচ্ছা। প্রখ্যাত কবি শঙ্খ ঘোষ এ গ্রন্থের নামকরণ করেছেন। লেখকের মননশীল রচনায় প্রতিভাত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের নানা বৈচিত্র্যময় গানের লীলার মধ্যে বাঙালির সর্বস্বতা ও সর্বনাশের দিকটি। লেখক এখানে বলতে চাইছেন যে রবীন্দ্রনাথই বাংলাগানের চূড়ান্ত গীতিকার ও সুরকার । তাঁর রচনার বাইরে গিয়ে এখনও পর্যন্ত কেউ রবীন্দ্রনাথের মৌলিকত্ব অতিক্রম করতে পারেননি, আর নতুন কিছু ভাবতে গেলেও রবীন্দ্র আদর্শই যেন রাস্তা ধরে নিয়ে যায়। অতএব বাংলাগানের আদর্শ রবীন্দ্রনাথ, গীতিকার ও সুরকার দু'দিক দিয়েই।

'সমকালীন গীতিকার ও রবীন্দ্রনাথ' আর 'গানের দুই রাজা' প্রবন্ধ দুটিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সঙ্গীতকারদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনামূলক আলোচনায় লেখক গীতিকার ও সুরকারের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করেছেন। লেখক লক্ষ করেন ১৩৩৬ থেকে ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের মধ্যে কবিতা থেকে গানের রূপান্তর হয় অধিক সংখ্যায় এবং এই সময়েই রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশটির বেশি কবিতা নানা উপলক্ষে গানে রূপান্তরিত হয়েছে। গানের সঙ্গে কবিতার নির্মাণগত তফাৎ অর্থাৎ কবিতার ও গানের ভাষ্যের ভিন্নরূপ লেখক উদাহরণসহ বিশ্লেষণ করেছেন। লেখক মনে করেন, রবীন্দ্রনাথ জীবনের মধ্য পর্বে রূপান্তর আর ভাঙাগড়ার খেলায় মেতে উঠেছিলেন। 'মোর গান এরা সব শৈবালের দল' কবিতাটির 'গানগুলি মোর শৈবালেরই দল' গানের রূপান্তরে লেখকের মতামত হল যে নতুন গানটি কেবল কবিতা থেকে ভাঙা গান নয়, এটি একেবারে নতুন সৃষ্টি, যা কবিতাটির চেয়েও নান্দনিকতায় ভরা। কবিতা থেকে গানে রূপান্তরের সময় রবীন্দ্রনাথ পরিবর্তন করেছেন কিছু শব্দ। আবার কবিতা লেখার অনেক পরে এতে সুর দিতে গিয়ে অন্য একটি পদ্ধতিও গ্রহণ করেন। সেটি হল স্তবকের শেষ পংক্তিকে ধুয়ো বানিয়ে কবিতাকে গানের প্যাটার্নে আনার কৌশল। সমালোচকের মতে রবীন্দ্রনাথের নাটকের গানকে অনেক সময় নাটক থেকে বিছিন্ন করে এনে গাইলেও গানের চরিত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। রবীন্দ্রনাটকের গানের রয়েছে দ্বৈত সত্তা, এক সঙ্গে তা নাটক ও গীতি পটভূমি গড়ে তোলার ক্ষমতা রাখে। লেখক লক্ষ করেন যে রবীন্দ্রনাথের নাট্যগীতি শেষপর্যন্ত যেন এক লক্ষ্যহীন অভিপ্রায়। অকারণেও অনেক সময় কবি নাটককে সাজিয়ে তুলেছেন গান দিয়ে, ঘটনা দিয়ে না সাজিয়ে নাট্যকার তথা কবি রবীন্দ্রনাথ নাটককে গান দিয়ে যেন ভুলিয়ে দিয়েছেন। সুধীর চক্রবর্তী এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে 'নটীর পূজা'কে নৃত্যনাট্য বলা যায় না, কারণ তাতে রয়েছে সংলাপের ভার এবং নাটকের তাপ। লেখক বলেন যে

রবীন্দ্রনৃত্যনাট্য নিঃসন্দেহে গীতাভিনয়ের একটি উপায় এবং কবির বিবেচনায় এখানে আগে থাকবে গান এবং সেই গানের অনুযায়ী নৃত্য। নৃত্যনাট্যের গানগুলি নাচের উপযোগী আর ঐ বিশেষ গানগুলির গঠনশৈলীতে আছে লয় ও তালের আলাদা সতর্কতা। তিনি মনে করেন, নৃত্যনাট্যে প্রাধান্য পেয়েছে নাটকীয় দ্বন্দ্ব ও সংঘাত, তবে নাচের চেয়ে গান পেয়েছে বেশি গুরুত্ব। লেখকের মতে রবীন্দ্রনাথ গান ভেঙেছেন সুরে উদ্দীপনা আনার জন্য, নাটকের উত্তেজনা বা করুণ রস সৃষ্টির জন্য, স্বদেশী গানে নির্ভীক ওজস্বিতার জন্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র সঙ্গীতজীবনে যত গান ভেঙেছেন তার মধ্যে হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সংখ্যাই বেশি। হিন্দী থেকে গান ভাঙার প্রবণতা রবীন্দ্রনাথের মধ্যবয়স পর্যন্ত ছিল। লেখকের মতে শাস্ত্রীয় গানগুলির সাহিত্যরসহীনতা রবীন্দ্রনাথকে পীড়া দিত, তাই কবি ঐ সুরগুলিতে নতুন কথা বসিয়ে মূল গানগুলির ভাব ও ভাষার দৈন্য মোচন করেছেন। আর লোকসঙ্গীতের মূল গানগুলির দৃপ্তসুর ও মুক্ত ছন্দ থেকে প্রেরণা নিয়ে কবি তাঁর স্বদেশী গানে যুক্ত করেছেন। লেখকের মতে এক সময়ের গান রচনায় কীর্তনের প্রাণরস ও আবেগ রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল।

রবীন্দ্রনাথ রচিত প্রথম কীর্তনাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীত হল ১২৯১ বঙ্গাব্দে রচিত 'আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি' এবং 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই।' বিশিষ্ট প্রাবন্ধিকের মতে গানে আবেগ সৃষ্টির কাজে কীর্তনের আখর অতি প্রয়োজনীয় শিল্প কৌশল অথচ শান্তিনিকেতন পর্বে রবীন্দ্রনাথ কীর্তনাঙ্গ গানে তেমনভাবে আর আখর যোজনা করেননি। কীর্তনাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীতে ছয়, সাত, আট, দশ মাত্রার সহজ তালই ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু কীর্তন গানের তালফেরতার রীতি রবীন্দ্রনাথের কীর্তনাঙ্গ গানে বর্জিত হয়েছে। সুধীর চক্রবর্তী বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক এবং বাংলা গান ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুরাগী গায়ক এবং বিদগ্ধ সমালোচক। এই গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে

বিষয় বিন্যাসের বৈচিত্র্যে আর নতুনত্বে রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে আলোচনার ইতিহাসকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

জয়ন্তী ভট্টাচার্য-র 'রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গান' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে। আলোচ্য গ্রন্থের সূচিপত্রে রয়েছে—ভূমিকা, গানের মন, দুঃখের বোধ, পূজার গান, দেশের গান, প্রেমের গান, প্রকৃতির গান, বিচিত্র, নাটকের গান, উপন্যাসের গান, মৃত্যুশোক, আদি থেকে অন্তে, দুঃখ থেকে আনন্দে, পরিশিষ্ট, দুঃখের গানের তালিকা ইত্যাদি।

এই গ্রন্থে লেখক রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে বিরহ বেদনা ও দুঃখের যে প্রকাশ তার মধ্যে রবীন্দ্রজীবনকে অন্বেষণ করেছেন। রবীন্দ্রজীবনচেতনার এই দিকটিকে তুলে ধরার জন্য পূজা, স্বদেশ, প্রেম, প্রকৃতি, বিচিত্র, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি নানা ধরনের রবীন্দ্রসৃষ্টির ধারা থেকে দুঃখবোধক গানের আলোচনাতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথ দুঃখের কবি নন, দুঃখসচেতন কবি। দুঃখ কবিকে অভিভূত করেনি, উদ্বুদ্ধ করেছে পরম তপস্যায় উত্তীর্ণ হতে। পূজা পর্যায়ের অন্তর্গত 'দুঃখ' উপপর্যায়ের গানের আলোচনায় গবেষক বলেন যে রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গান যেগুলিকে বলা যায় তার পটভূমিকায় দুঃখ থাকলেও পরিণতিতে ব্যঞ্জিত হয় আনন্দ। 'দুঃখ' উপপর্যায়ের গানকে তিনি চারভাগে ভাগ করেছেন তাঁর আলোচনায়, তা হলো— পূর্ণতার বিচ্ছেদ-অহেতুক বেদনা, দুঃখের সাধনা দুঃখের তত্ত্ব, দুঃখের সাধনা প্রত্যক্ষ রূপ-সংগ্রামের কথা, জীবন বিচ্ছেদ-মৃত্যুচিন্তা। 'দেশের গান' অধ্যায়ে লেখিকা রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে রচিত 'জাতীয়সঙ্গীত' গুলির উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, 'স্বদেশী গান' নামে চিহ্নিত গানগুলি দুই প্রকার—ভারতের গৌরব গাথামূলক গান ও আত্ম উদ্বোধনমূলক গান। স্বদেশী গানের মূল সুরটিতে কোথাও কোথাও ভারতের দুর্গতিও বেদনার প্রকাশ থাকলেও অবশেষে সেই বেদনাকে

অতিক্রম করার চেষ্টাই করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সমালোচক রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানেও দুঃখ ও বিরহকেই অধিক পরিমাণে লক্ষ করেছেন। তাঁর মতে প্রথম জীবনে প্রেমের বেদনাই মুখ্য, কারণ অচিরস্থায়িত্বের অতৃপ্তি আর পরিণত বয়সে বিগতস্মৃতির জন্য ব্যাকুলতা রয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রেমবিষয়ক গানে। প্রকৃতির গানের বিষয়ে তাঁর আলোচনায় দেখিয়েছেন যে ছিন্নপত্রের যুগে প্রকৃতির সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পর থেকেই কবি প্রকৃতির মাধ্যমেই বিশ্বরহস্যের সমাধান করতে চেয়েছেন।

তিনি মনে করেন যে কবির গানে গ্রীষ্মের দাবদাহের মধ্যে রয়েছে বর্ষার সম্ভাবনা। তবে তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথের ঋতু সঙ্গীতগুলির মধ্যে বর্ষার গানে বেদনার সুর সবচেয়ে বেশি ঝংকৃত হয়েছে। বর্ষার গানের বৈশিষ্ট্য হল অতীত স্মৃতি, বিরহ, অহেতুক বেদনা। আবার শরতের গান বেদনা শূন্য, শীতের শূন্যতার বিহ্বল বিলাপের মধ্যে পাওয়া যায় বসন্তের আগমন ধ্বনি, ধরাতলে বসন্তের আনন্দ ও উল্লাসের মধ্যেও যেন বেদনা বাজে। লেখকের মনে হয়েছে যে কবিকে ফাগুন দিনে কাঁদনভরা হাসি হাসায় বসন্তের ললিত রাগের মধ্যে লুকানো বিদায় ব্যাথা। অর্থাৎ বসন্তের পূর্ণতার মধ্যে কবি তাড়িত হচ্ছেন পূর্ণতার অস্থায়ীত্ব নিয়ে, রিক্ততা নিয়ে। 'বিচিত্র' পর্যায়ের নানা ভাব সমৃদ্ধ গানের মধ্যেও সমালোচক দুঃখের সন্ধান পান। তাঁর মনে হয় এ পর্যায়ের গানগুলিতে কবির কণ্ঠস্বর বা অভিব্যক্তি অনেকটাই ব্যক্তিগত, কবি যেন একান্ত মগ্ন আপন সুরের ভুবন মাঝে। 'বিচিত্র' পর্যায়ের গানে গবেষক লক্ষ করেন দুঃখসুখের তালে তালে এ জীবন নটরাজের চরণের তলে নৃত্যরত। রবীন্দ্রনাটকে দুঃখের গানের আলোচনায় সমালোচক বলনে যে রবীন্দ্রনাটকে বেদনার প্রকাশ ঘটেছে গানে। 'চিরকুমার সভা'র কৌতূকময় পরিবেশে প্রেমের গানে বেদনা সঞ্চারিত হয়েছে। 'রক্তকরবী'র বিশুর গান তার ব্যক্তিগত বেদনার প্রকাশ। 'মুক্তধারা'র ধনঞ্জয়ের গান দুঃখের গান নয়, দুঃখবরণের গৌরবগান। 'গৃহ প্রবেশ'

নাটকেও দুঃখের গানের সার্থকতম প্রকাশ ঘটেছে। নাটক বিচ্ছিন্নভাবেও এইসব দুঃখের গানগুলি সফল। গবেষক বিভিন্ন পর্যায়ের গানের আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন কীভাবে রবীন্দ্রমননে দুঃখবোধ সংকল্প ও সাধনার নানা স্তর পেরিয়ে পরিণতি লাভ করেছে আনন্দময় চেতনালোকে। সমালোচকের বক্তব্য হল—

> ''রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গান যেগুলিকে বলা যায়, তার পটভূমিতে দুঃখ থাকলেও পরিণতিতে ব্যঞ্জিত হয় আনন্দ। ...তাঁর জীবনে পটপরিবর্তন হয়েছে বার বার, বদলে গেছে গানের ভাষাও। প্রথম বয়সে মৃত্যুর সঙ্গে প্রথম প্রত্যক্ষ পরিচয় যে আবেগরুদ্ধ অভিমান জাগিয়েছে, শেষ বয়সের সংহত শোকচেতনার সঙ্গে তার অনেকখানি তফাৎ। ...কঠোরের সঙ্গে মধুরের, বিরহের সঙ্গে মিলনের এই যে মালা বদল তা-ই প্রকৃতির নিয়ম, মানুষের নিয়তি। একে সত্য বলে স্বীকার করে নিলেই জীবনের আনন্দময় তাৎপর্য চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের 'দুঃখের গান' সেই স্বীকৃতি চেষ্টারই রসভাষ্য।''[৭]

গবেষকের ভাবনার আলোকে উদ্ভাসিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের কাব্যধারায় দুঃখের উপস্থাপনায় রবীন্দ্রানুরাগীরা রবীন্দ্রগানের সাথে নতুন ভাবে পরিচিত হবেন, জানবেন মৃত্যু ভাবনা থেকে অমৃতলোকে পৌঁছবার বার্তা।

শৈলজারঞ্জন মজুমদারের 'যাত্রাপথের আনন্দগান' গ্রন্থটি প্রথম প্রকশিত হয় ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। আমাদের সংগৃহীত গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ২০১১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে। বরেণ্য রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ শৈলজারঞ্জনের স্মৃতিচারিত গ্রন্থের অনুলেখিকা তাঁরই ভ্রাতৃবধূ শ্রীমতী সবিতা দত্ত মজুমদার। রসায়ন

শাস্ত্রের স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী কেমন করে রবীন্দ্রগানের একজন শিক্ষক, বিশেষজ্ঞ, স্বরলিপিকার তথা শান্তিনিকেতনের সঙ্গীতভবনের অধ্যক্ষরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন, স্মৃতিকথায় উঠে আসা ঘটনাগুলি অনুলেখিকার প্রাণস্পর্শী লেখনিতে প্রতিভাত হয়েছে। গ্রন্থের মোট আটাশটি অধ্যায়ে নানা ঘটনাবিন্যাসে ব্যক্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের সাথে শৈলজারঞ্জনের অন্তরঙ্গ ও বিশ্বাসযোগ্য সম্পর্কের কথা।

শৈলজারঞ্জন বলেছেন—

> ''দিনেন্দ্রনাথ চলে যাবার পর গুরুদেব একদিন প্রশ্ন করলেন, তোমার গান কেমন চলেছে? ... তোমার গান থামলে তো চলবে না ... আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব। ... তাঁর প্রিয় গান শিখিয়ে দিতেন। গানের ষ্টক করতাম বলে 'গীতাম্বুধি', মানে 'গানের সাগর' বলে ডাকতেন। ... বছর খানেক গান শেখার পর ছোটদের গান শেখাতে শুরু করেছি। ... আমি গান শিখেই চলেছিলাম, ক্লাস নেব ভাবিনি। ... গানটান একটু এগিয়েছে তখন গুরুদেব হঠাৎ আমায় প্রশ্ন করলেন, তোমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করে তুমি কী করো, ... অধ্যাপনা তো করো, কী বিষয়ে বলবে? ... দু'টো মিশিয়ে বলবে... কেমিক্যাল মিউজিক, নয় বলবে মিউজিক্যাল কেমিষ্ট্রি। ... রসায়নের অধ্যাপনায় আমার কিছুমাত্র কৃতিত্ব আছে গুরুদেব সেটা মানতে চাইতেন না, অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে গানেই ডুবে থাকি এটাই ছিল তাঁর মনোগত বাসনা। ...অযাচিতভাবে গুরুদেবের স্নেহকরুণার ধারা নানাভাবে আমার জীবনে নেমে এসেছে।... বাড়িতে বসেই জন্মদিনের

কবিতাটি লাভ হল। গুরুদেব বেয়ারাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন—'জন্মদিন এল তব আজি/ভরি লয়ে সঙ্গীতের সাজি।/ বিজ্ঞানের রসায়ন রাগরাগিনীর রসায়নে পূর্ণ হলো তোমার জীবনে।/কর্মের ধারায় তব রসের প্রবাহ যেথা মেশে,/সেইখানে ভারতীর আশীর্বাদ অমৃত বরষে।"[৮]

রবীন্দ্রসঙ্গীতের একনিষ্ঠ সাধক কীভাবে রবীন্দ্রগানের স্বরলিপিকে পাঠ্যতালিকাভুক্ত করেছিলেন, গ্রন্থ মধ্যে তার উল্লেখ রয়েছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপির ইতিহাসকেও এখানে পাওয়া যায়। শৈলজারঞ্জন এর কথায়

"আশ্রমে দিনেন্দ্রনাথ ছাড়া কেউ স্বরলিপির ধার ধারতেন না। গানগুলি কণ্ঠ থেকে কণ্ঠে তুলে নিতাম। ... বই খুলে দেখি, গাওয়া সুর একেবারে অন্যরকম, স্বরলিপির সঙ্গে মিলছে না। ... সঙ্গীতভবনে অধ্যক্ষ যখন হলাম, তখন স্বরলিপিকে পাঠ্যতালিকায় ঢোকাতে গিয়ে কোনও দিক থেকে উৎসাহ পাইনি। ... এরকম সমস্যায় পড়লেই আমি গুরুদেবের কাছ থেকে সমাধান নিয়ে আসতাম। তিনি স্বরলিপি শেখাতে আমাকে খুব উৎসাহিত করলেন। বললেন, স্বরলিপি এমনভাবে শেখাবে যেন চিঠি পড়ার মতো প্রত্যেকে স্বরলিপি পাঠ করতে পারে। গুরুদেবের এ আদেশ নিয়ে পাঠক্রমে স্বরলিপি দেওয়া সম্ভবপর হয়েছিল। গুরুদেবের প্রয়াণের পর ইন্দিরাদেবীকে প্রণেত্রীরূপে পেয়ে তাঁর সাহায্য ও উৎসাহে ছাত্রছাত্রীদের স্বরলিপি শেখানো পাকাপাকিভাবে চালু করা সম্ভব হয়েছিল। সঙ্গীতভবনে

স্বরলিপি প্রস্তুত করা ও পাঠ করা— দু'রকমই ব্যবস্থা করা হয়েছিল।"[৯]

গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ের ঘটনাবিন্যাসের আলোচনায় বেশকিছু রবীন্দ্রসঙ্গীতের উল্লেখের মধ্যে জানা যায় এ সমস্ত রচনার নেপথ্য ইতিহাস। বিশেষ করে এয়োবিংশ অধ্যায়ে উল্লিখিত ১৯৩৯ সনের বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানের জন্য রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান রচনার পথ ধরে 'ওগো সাঁওতালী ছেলে', 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল', 'আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে', 'এসোগো জ্বেলে দিয়ে যাও প্রদীপখানি', দুই ছন্দে ও সুরে 'আজি ঝরঝর মুখর বাদল দিনে', 'স্বপ্নে আমার মনে হল', 'এসেছিলে তবু আস নাই', 'এসেছিনু দ্বারে তব', 'নিবিড় মেঘের ছায়ায় মন দিয়েছি মেলে', 'পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে', 'শেষ গানেরই রেশ নিয়ে যাও চলে', 'আজি মেঘ কেটে গেছে সকাল বেলায়', 'সঘন গহন রাত্রি ঝরিছে শ্রাবণধারা', 'ওগো তুমি পঞ্চদশী' 'যবে রিমিকি ঝিমিকি ঝরে' গানগুলির রচনা ও সৃষ্টির বিচিত্র কাহিনী উঠে এসেছে। গ্রন্থের চতুর্বিংশ অধ্যায়ে রয়েছে 'সমুখে শান্তি পারাবার' গানটির কথা। আচার্য শৈলজারঞ্জন মজুমদার লিখেছেন,

"সে বছরই (১৯৩৯) শীতকালে গুরুদেব 'ডাকঘর' মঞ্চস্থ করার আয়োজন করেছিলেন। বেশ কিছুদিন তার মহড়া চলছিল। এতে কোনও গান ছিল না। এবাবে. এর জন্য কিছু গান রচনা করলেন। তার মধ্যে 'সমুখে শান্তি পারাবার' গানটি উল্লেখযোগ্য। এ গানটি গুরুদেব নিজে মহড়ার সময় ঠাকুরদার ভূমিকায় অমলের অন্তিমশয্যায় তার শিয়রে বসে গেয়ে শোনাতেন। ... গানটি রচনা করে গুরুদেব আমাকে দুপুর একটায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ... আমি গানটি

যথারীতি গলায় তুলে নিয়ে যখন স্বরলিপি করে চলে আসছি, তখন পেছন থেকে ডেকে গুরুদেব ধ্যানগম্ভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, আজ আমি প্রত্যক্ষ যা দেখলাম তা-ই এখানে লিখে রেখে গেলাম, ...আমার যখন হয়ে বয়ে যাবে তখন এ গানটি করে দিয়ো। ... অন্য গানের মতো এ গানটি তুমি আর কাউকে আগে শিখিয়ো না। ... 'সমুখে শান্তি পারাবার' গানটি তারপর আমি চাপা দিয়ে গোপনে রেখে দিয়েছিলাম। প্রথম বার করলাম গুরুদেবের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে। সেদিন মন্দিরে যে উপাসনা হয়েছিল তাতে এই গানটি চোখের জলে সমবেত কণ্ঠে করা হয়।"[১০]

এই গ্রন্থে অপূর্ব স্মৃতিরোমন্থনের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথের বিশ্বস্ত শিষ্য আচার্য শৈলজারঞ্জন মজুমদার রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার প্রসারের ইতিহাসের একটা দিক তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চায় এই গ্রন্থটি রবীন্দ্রানুরাগীদের রবীন্দ্রসঙ্গীতের অজানা তথ্য জানতে সাহায্য করে। এ ধরনের গ্রন্থ আজ দুর্লভ বললে কম বলা হবে।

।। ছয়।।

রবীন্দ্রসঙ্গীত আলোচনার সমীক্ষায় এবারের আলোচ্য গ্রন্থ হল কালিদাস নাগ-এর 'সুরের গুরু রবীন্দ্রনাথ ও গুরুদেবের পত্রাবলী' প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে। মিতায়তন ১১১ পৃষ্ঠার গ্রন্থে আলোচিত বিষয়সূচি হল—ভানুসিংহের পদাবলী, রবিচ্ছায়া, স্বদেশী গানে রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের সাধনসঙ্গীত,

রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভবিষ্যৎ, শান্তাদেবী ও কালিদাস নাগকে লিখিত গুরুদেবের পত্রাবলী।

এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের নাম ছিল 'সুরের গুরু রবীন্দ্রনাথ'। প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে। বর্তমান গ্রন্থটিকে দ্বিতীয় মুদ্রণ বলা চলে। পূর্বের গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে শান্তাদেবী ও কালিদাস নাগকে লিখিত গুরুদেবের পত্রাবলী। গ্রন্থকার জানিয়েছেন গ্রন্থভুক্ত চারটি প্রবন্ধ প্রথমে 'মাসিক বসুমতী', 'ভারতবর্ষ' ও 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' প্রকাশিত হয়েছিল। লেখক গ্রন্থটির 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' নিবন্ধটিতে ভানুসিংহের পদাবলীর রচনাকাল ও পদাবলী রচনার নানা ঘটনার উল্লেখ করে পদাবলী সাহিত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অল্পবয়সের 'অচলিত' রচনাসমূহের মধ্যে 'রবিচ্ছায়া' যেখানে একসময়ে রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি আদায় করেছিল, সেখানে ভানুসিংহের পদাবলীকে কবি কেন ব্রাত্য করেছিলেন এ বিষয়ে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন লেখক।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম নিজস্ব গীতিসংকলন 'রবিচ্ছায়া'র উপস্থাপন করে লেখক 'রবিচ্ছায়া' প্রকাশের ইতিহাসও তুলে ধরেছেন। স্বদেশী গানের আলোচনায় লেখক রবীন্দ্রপূর্ব ও রবীন্দ্রসমকালীন স্বদেশী সঙ্গীতের পাশে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সঙ্গীতের সুর-তাল-লয়ের স্বকীয়তার উজ্জ্বল দিকটি তুলে ধরেছেন। লেখক রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সঙ্গীতগুলিকে 'জাতির সম্পদ' রূপে আখ্যায়িত করে এগুলির বৈজ্ঞানিক প্রচারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করেছেন। লেখকের মতে,

> ''এই গানগুলির ভিতর দিয়ে শুধু বাঙালি তার বাংলামায়ের
> অপূর্ব মূর্তিই দেখেনি, ... অনবদ্য রচনার ভিতর দিয়ে
> মানব-স্বাধীনতারই যেন প্রতীক হয়ে ফুটে উঠেছে।''[১১]

রবীন্দ্রনাথের সাধনসঙ্গীত সম্বন্ধে বিশ্লেষণে লেখক দেখিয়েছেন কীভাবে

রবীন্দ্রনাথের সাধনসঙ্গীতের মধ্যে অনুরণিত হয়েছে বৈরাগী একতারার ছন্দে অদ্বৈততত্ত্ব, বিশ্ববোধ ও বিশ্বমৈত্রী। শ্রদ্ধেয় প্রাবন্ধিক বলেছেন যে বারে বারে মৃত্যু আঘাতে জর্জরিত কবি নিজের জীবনের দুঃখ বেদনাকে বিশ্বমানবের চিরন্তন সম্পদ করে রেখে গেছেন তাঁর জীবনের শেষ চল্লিশ বছরের ধর্মসঙ্গীতে। এছাড়া লেখকের লেখনীতে আভাস পাওয়া যায় ভবিষ্যতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মাধ্যমে পূর্ব-পশ্চিমের সমন্বয়ের সম্ভাবনার কথা। গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত শ্রী নাগকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লেখকের নিবিড়তা, আত্মিকতা ও লেখকের কর্ম নিপুণতার সন্ধান মেলে। রবীন্দ্রস্নেহধন্য কালিদাস নাগকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রে ১৯২২ এর ১৪ নভেম্বর ও ১৯২৪ এর ১১ জানুয়ারিতে রয়েছে—

> "... তুমি ফিরে আসচ এতে আমার মন খুব আশান্বিত হয়ে উঠেচে। মনে রেখো তোমাকে আমি কিছুতেই ছাড়ব না। বিশ্বভারতীতে তুমি তোমার প্রশস্ত ক্ষেত্র পাবে... আমার শেষ দান তোমাদের হাতে দিয়ে যেতে পারলে আমার মন প্রসন্ন হবে। ... হিন্দু য়ুনিভার্সিটি কনভোকেশনে নিমন্ত্রণ পেয়েছি। ... তোমাকে সঙ্গে নিতে চাই, তুমি সেখানে একটা লেকচার দেবে সেটাতে বিশ্বের মধ্যে বিশ্বভারতীর স্থান তোমাকে নির্দ্দেশ করতে হবে।"[১২]

রবীন্দ্রসান্নিধ্যধন্য এরকম এক ব্যক্তিত্বের লিখিত এই গ্রন্থটি রবীন্দ্রসঙ্গীত তথা রবীন্দ্রানুরাগীদের কাছে যথার্থ অর্থেই পরম আদরনীয় ও সমাদৃত হয়ে আছে।

।। সাত।।

ড. দেবজ্যোতি দত্ত মজুমদার-এর 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্রবিকাশ ও বিবর্তন' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। সংগৃহীত আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়সূচিতে রয়েছে—ভূমিকা, নিবেদন, সূচনাপর্ব, রবীন্দ্রসঙ্গীত সৃষ্টির প্রথম যুগ, রবীন্দ্রসঙ্গীত সৃষ্টির দ্বিতীয় যুগ, রবীন্দ্রসঙ্গীত সৃষ্টির তৃতীয় বা শেষ যুগ, উপসংহার, গ্রন্থপঞ্জী, উল্লিখিত ও আলোচিত গানের তালিকা, নির্দেশিকা।

গ্রন্থের নিবেদনে লেখক জানিয়েছেন যে পুস্তকটি তাঁর রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে গবেষণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, অবশ্য এই পুস্তকের গবেষণার বিষয়কে পরিমার্জিত করা হয়েছে। গ্রন্থ মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-রচয়িতা হিসাবে আবির্ভাবের সময় বাংলা গানের অবস্থা, সঙ্গীত সৃষ্টিতে পূর্বসূরিদের ভাব এবং সঙ্গীত মানস গঠনে রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক আবহাওয়ার প্রভাব সম্পর্কে সূচনাপর্বে আলোচনা করে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সৃষ্টিকে ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনের ধারায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগে বিভক্ত করে লেখক উপস্থাপন করেছেন। প্রতিটি যুগের আলোচনা শেষে সেই যুগের উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জী এবং উল্লেখযোগ্য গানের তালিকাও রয়েছে গ্রন্থটিতে। লেখক তিনটি যুগের কালবিভাজন করেছেন যথাক্রমে প্রথম যুগ (১৮৭৭-১৯০০), দ্বিতীয় যুগ (১৯০১-১৯২০) আর তৃতীয় বা শেষ যুগ (১৯২১-১৯৪১)।

প্রত্যেকটি যুগে রবীন্দ্র সৃষ্টির বিশ্লেষণে লেখক সেই যুগে সৃষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীতকে গানের চরিত্র ও গঠন অনুযায়ী কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করেছেন। প্রথম যুগের সঙ্গীত সৃষ্টি নিয়ে লেখক বলেন যে এই যুগকে (১৮৭৭-১৯০০)

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনার শিক্ষানবীশ যুগ বলা চলে। এই যুগে রাগাশ্রয়ী ও ভারী ভারী তালের উপর রচিত সুরধর্মী গানেরই প্রাধান্য। লেখকের মতে এই যুগে রাগাশ্রয়ী গানের মধ্যে হিন্দুস্থানী গান ভেঙে যে সব গান রচিত হয়েছে তাতেও রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট স্বকীয়তা দেখিয়েছেন। সমালোচকের ভাষায়,

> ''এই যুগের ধর্মসঙ্গীতগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাব ও ভাষার দিক দিয়ে ব্রহ্মসঙ্গীতই রয়ে গেছে— পূজার গানে রূপান্তরিত হয়নি।''[১৩]

লেখকের মতে প্রথম যুগের গানে লোকসুরের বিশেষ প্রভাব নেই, আর ঋতুসঙ্গীতেরও বিশেষ সাক্ষাৎ এ যুগের গানে নেই। ড. দত্ত মজুমদার লক্ষ করেন যে প্রথম যুগের স্বদেশী গানের কথা ও সুরারোপে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বসূরি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—এঁদের দ্বারা প্রভাবিত, তবে রামপ্রসাদী সুরে 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে'—যা কলকাতার কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে কবি গেয়ে শোনান, তাছাড়া ভৈরবীতে রচিত 'অয়ি ভুবনমনোমোহনী' গানগুলিতে কবি স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখেন। রবীন্দ্র সৃষ্টির প্রথম যুগের আলোচনায় গীতিনাট্যগুলি সম্বন্ধে লেখকের ভাবনা হল—

> ''বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়া গীতিনাট্যের গান যদিও অনেক ক্ষেত্রে অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত, কিন্তু এই দুটি নাটকে আমরা দুটি জিনিস পাই যার গুরুত্ব যথেষ্ট ও যা তাঁর পরবর্তী সঙ্গীত সৃষ্টিতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। তার মধ্যে একটি হল হার্বার্ট স্পেনসরের প্রভাবে মানুষের মনের ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সুরের প্রয়োগে নাট্যসঙ্গীত সৃষ্টি করা ... দ্বিতীয় জিনিস হল সংলাপধর্মী

গদ্যগানের স্বল্প ব্যবহার যার পরিণত রূপ আমরা পাই পরবর্তী সঙ্গীত সৃষ্টিতে, বিশেষভাবে নৃত্যনাট্যগুলিতে। 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যের সুরসৃষ্টিতে একটা পরিণতির ভাব লক্ষ্য করা যায় এবং কথা ও সুরের সার্থক মিলনের একটা প্রচেষ্টা ... তাছাড়া দেহাতীত প্রেমসঙ্গীত যা তাঁর পরবর্তীকালে রচিত প্রেমসঙ্গীতগুলিকে পূজার উপান্তে এনে উপস্থিত করেছে তার সূচনা বা সৃষ্টি লক্ষ্য করা যায় 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যের গানগুলিতে। "[১৪]

ড. দত্ত মজুমদারের গবেষণায় ধরা পড়ে যে প্রথম যুগের সঙ্গীত সৃষ্টিতে কবি বিভিন্ন ধারার সঙ্গীতের আদর্শকে অবলম্বন করে গান রচনা করলেও তারই মধ্যে কবির স্বকীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য কথা ও সুরের সমন্বয় সাধন এবং গানে অলংকরণের বাহুল্য বর্জন প্রথম যুগের রচনা থেকেই কবির মৌলিকতার সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করে।

লেখকের মতে, রবীন্দ্রসঙ্গীত সৃষ্টির দ্বিতীয় যুগে (১৯০১-১৯২০) রবীন্দ্রনাথ শিক্ষানবিশী ভাব অনেকটা কাটিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে স্বকীয় ভঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করেছেন নানা দিক থেকে। লেখক লক্ষ করেন যে, এই পর্বে গান ভাঙার চেয়ে কাব্যের ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ব্যবহৃত রাগের স্বরগত শাস্ত্রীয় রূপকে কিছু অদল বদল করে ও নানা রাগমিশ্রণের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ মৌলিক সঙ্গীত সৃষ্টিতে প্রয়াসী। যার ফলে আগের যুগে সুরধর্মী গান থেকে ধীরে ধীরে কাব্যধর্মী হয়ে উঠেছে এ পর্বের রবীন্দ্রসঙ্গীত। লেখকের মতে 'গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালি'র রাগভিত্তিক অথচ কাব্যমণ্ডিত গানগুলিই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাছাড়া এ যুগে আগের তুলনায় ঋতুসঙ্গীতও ধরা দিয়েছে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতে 'শারদোৎসব'

নাটককে কেন্দ্র করে। গবেষক মনে করেন এই যুগে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষে রচিত কবির স্বদেশী সঙ্গীতে লোকসঙ্গীত বিশেষ করে বাউল অঙ্গের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে, কিন্তু এই স্বদেশী গানই তাঁর গঠনে কিছুকালের মধ্যেই বাংলাদেশ পার হয়ে প্রথমে ভারতীয় ও পরে আন্তর্জাতিক হয়ে গেছে। স্বদেশী গানের সুর লোকআঙ্গিক থেকে প্রচলিত রাগাশ্রিত সুরেই আশ্রয় নিয়েছে। এই যুগে রবীন্দ্রনাথের গানে নতুন তালের প্রবর্তন নিয়ে লেখকের মতামত হল—

> ''গানের কাব্যাংশ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তাঁকে তালের বেলায়ও নতুন পথ ও নতুন ব্যাখ্যার কথা ভাবতে হয়েছে। ... ফলশ্রুতি স্বরূপ দেখা দিল এই যুগে তাঁর সৃষ্ট বা প্রবর্তিত রূপকড়া, নবতাল, একাদশী, ঝম্পক, ষষ্ঠী ও নবপঞ্চ তালগুলি। ... এর মধ্যে নবতাল, একাদশী ও নবপঞ্চতালের উপর ভিত্তি করে এই যুগে গান রচনা করলেও পরবর্তী যুগে কিন্তু কবি এইসব তালে আর কোনো গান বাঁধেননি। তবে ঝম্পক, ষষ্ঠী ও রূপকড়া তাল কবি পরবর্তী যুগেও তাঁর গানে ব্যবহার করেছেন। এদের মধ্যে সব ক'টি তালকেই পুরোপুরি রবীন্দ্র-সৃষ্টি বলা চলে কিনা সে বিষয়ে একটু সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ, তাদের মধ্যে ষষ্ঠী ও রূপকড়া তালের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় পত্তি, রূপক ও সারি তালের কিছুটা সাদৃশ্য আছে।''[১৫]

লেখকের আলোচনায় (১৯০১-১৯২০) এই পর্বে রবীন্দ্রসঙ্গীত সৃষ্টিতে আর যা যা উল্লেখযোগ্য সেগুলো হল—বড়ো বড়ো কবিতায় সুরারোপে কাব্যসঙ্গীত এর সৃষ্টি, আর এ গানগুলিতে বিলাতীসুরের প্রচ্ছন্ন প্রভাব। রবীন্দ্রনাথের ধর্মসঙ্গীত

ব্রহ্মসঙ্গীতের গোষ্ঠী প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে পূজা পর্যায়ে রূপ নিয়েছে সুর ও তালগত অনেক সহজ ও সরল ধারায়, এও লেখক লক্ষ করেছেন এই যুগের সৃষ্টি সম্ভারে। এই যুগের সৃষ্টি ধারায় রবীন্দ্রনাথের অনেক গীতিবহুল নাটকও রয়েছে, যার গানগুলি নাটকের বাইরে এনেও পরিবেশনযোগ্য। সর্বোপরি এই যুগে রবীন্দ্রনাথ স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে বসবাস শুরু করার ফলে তাঁর সঙ্গীত সৃষ্টিতে শান্তিনিকেতন আশ্রমের জীবন ও প্রকৃতি ধীরে ধীরে প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সৃষ্টির তৃতীয় যুগের (১৯২১-৪১) কথা আলোচনা করতে গিয়ে গবেষক বলেন—

> ‘‘এই যুগকে আমরা প্রকৃত রবীন্দ্রসঙ্গীত সৃষ্টির যুগ বলতে পারি যেখানে রবীন্দ্রসঙ্গীত অন্যান্য সব সঙ্গীতের প্রভাব মুক্ত হয়ে নিজ বৈশিষ্ট্যের দাবীতে আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। এই যুগকে স্বচ্ছন্দে প্রকৃত রবীন্দ্রসঙ্গীতের মৌলিক সৃষ্টির যুগ বলা যেতে পারে। ... শেষ যুগের গানগুলির তাল যদিও বা গান শুনে বা স্বরলিপি দেখে নির্ণয় করা সম্ভব, কিন্তু তাদের রাগ নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার।... গানের কথা ও ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাতে নানা রাগের স্বরূপ এসে মিশে গেছে।’’[১৬]

গবেষক এই যুগের রবীন্দ্রসৃষ্টিতে আরও লক্ষ করেছেন যে রবীন্দ্রনাথের গানগুলির বহুমাত্রিকতা—একই গান পূজা, প্রেম, ঋতু, রাগসঙ্গীত, কীর্তনাঙ্গ, বাউলাঙ্গ ইত্যাদি নানা রূপে ধরা দেয়। লেখকের মতে শেষযুগে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সঙ্গীতগুলি হয়ে উঠেছে আত্মজাগরণ আর উদ্দীপনার গান। ঋতুসঙ্গীতের দিক দিয়েও এই যুগে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাণ্ডারে ঘটেছে সমৃদ্ধি।

শেষ যুগে কবির বিশেষ সৃষ্টি হল নৃত্যনাট্যগুলি, যা কথা, সুর ও ছন্দের সমন্বয়ে এক অনবদ্য সৃষ্টি। গবেষক মনে করেন যে রবীন্দ্রনাথের শেষযুগের গান সবদিক থেকেই একান্ত সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছিল, আর এই নৃত্যনাট্যের গানগুলি তাঁর সঙ্গীত রচয়িতা হিসাবে সার্থকতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফসল। গবেষক ড. দত্ত মজুমদার তাঁর গবেষণাধর্মী লেখনীতে মূলত তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরগত ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনকে। নানা অঙ্গের রবীন্দ্রসঙ্গীতের অবতারনায় উঠে এসেছে সঙ্গীত সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের অনন্যতা আর মৌলিকতার পরিচয় প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে আলোচনার ধারায় গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য কারণ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতসৃষ্টির প্রায় ছয়টি দশকের ইতিহাস আলোচ্য গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে।

।। আট।।

শৈলজারঞ্জন মজুমদার-এর 'রবীন্দ্রসঙ্গীত চিন্তা' গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে। সংগৃহীত গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত সংস্করণ। লেখকের নিবেদন থেকে জানা যায় এই গ্রন্থভুক্ত পাঁচটি প্রবন্ধ নিয়ে 'রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসঙ্গ' নামে একটি গ্রন্থ ঢাকা থেকে পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রবন্ধের সংকলন গ্রন্থটির সূচিতে রয়েছে—রবীন্দ্রসঙ্গীতের মর্মলোকে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাব ও শিক্ষা, রবীন্দ্রসঙ্গীতের ঐতিহ্য, রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে ভাবনা, রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা প্রসঙ্গে, রবীন্দ্রসঙ্গীতে স্বরলিপি ও রেকর্ডের ভূমিকা, রবীন্দ্রনাথের গান কেমন করে গাইতে হবে, সবচেয়ে স্থায়ী হবে আমার গান, রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কী, তালিমী রবীন্দ্রসঙ্গীত, নিরাভরণ রবীন্দ্রসঙ্গীত, নবীন ঋতুনাট্যে দক্ষিণী সুরে গান, রবীন্দ্র নৃত্যাভিনয়, রবীন্দ্রসঙ্গীত পদ্ধতি, প্রকরণ ও বিকৃতি প্রসঙ্গে, রবীন্দ্রসঙ্গীতে ধ্রুপদ সঙ্গীতের প্রভাব

ও উপকরণ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি চিঠি, জীবনপঞ্জি।

গ্রন্থটির ভূমিকা শোভামণ্ডিত হয়েছে রাণী চন্দের ভাষ্যে। নিবন্ধগুলির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতাচার্য সঙ্গীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের সামগ্রিক রূপকে রবীন্দ্রানুরাগী পাঠকদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে লেখকের নান্দনিক মন্তব্য,

> ‘‘রবীন্দ্রসঙ্গীত এক নতুন জগৎ সৃষ্টি করেছে যা মানুষকে তার আদর্শ আনন্দলোকের আরো নিকটে নিয়ে যেতে পারে। ... অনির্বচনীয়তাকে বাস্তব করে তুলতে পারে। এই সম্পদ বাঙালির উত্তরাধিকার হলেও তা তার একার নয়—তা বিশ্বের সম্পদ।’’[১৭]

রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিকৃতি রোধে সঙ্গীতাচার্য শুদ্ধভাবে চর্চাকে একমাত্র উপায় হিসেবে দেখিয়েছেন, তাছাড়া রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষায় ট্র্যাডিশন থাকা দরকার বলে তিনি মনে করেন। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ যে সঙ্গীত শিক্ষার ধারা প্রবর্তন করেছিলেন সেই ধারায় শিক্ষিতরা বুনিয়াদকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিতে হবে শিক্ষাদান কালে সতর্ক থেকে। এ ব্যবস্থাও বিকৃতি রোধে সহায়ক বলে তিনি তাঁর লেখায় গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞানই যথেষ্ট নয়, রবীন্দ্রসংস্কৃতির সঙ্গে আত্মিকতা অর্জনও এক্ষেত্রে প্রয়োজন। কাব্যধর্মী রবীন্দ্রসঙ্গীতে কথা ও সুরের পারস্পরিক যে বেগ রয়েছে সেই ভাবরসকে যথাযথ উপলব্ধি না করতে পারলে শুধু সাংগীতিক নৈপুণ্য দ্বারা রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুষ্ঠ পরিবেশন সম্ভব নয় বলে লেখক মনে করেন। লেখকের উপলব্ধিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত একটি বিশেষ শ্রেণির সঙ্গীত যা রচয়িতার সংযোজিত কথায় সুরে গুরুশিষ্য পরম্পরায় প্রতিষ্ঠিত গায়কী আয়ত্ত করেই পরিবেশন করতে হবে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের উপযোগী কণ্ঠ তৈরিতে বিশিষ্ট

রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষক শৈলজারঞ্জনের মতে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীর দখলে থাকতে হবে স্বরের সমতাগুণ, সুরের শুদ্ধি আয়ত্তকরণ, সূক্ষ্ম কারুকার্য করার নৈপুণ্য, রেশ, মীড়, শ্রুতি প্রয়োগ ইত্যাদি।

তাঁর মতে রবীন্দ্রসঙ্গীতে শ্রোতারও অনুশীলন দরকার এ গানকে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য। তাঁর জোরালো বক্তব্য হল রবীন্দ্রসঙ্গীতের শ্রোতার এ গানের গায়কী তথা সহজভাব গ্রহণের ক্ষমতা থাকতে হবে। লেখকের ভাবনায়,

> ''রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কি হল রবীন্দ্রসঙ্গীতের আপন বৈশিষ্ট্য পরিচায়ক কতকগুলি আঙ্গিক ও দিকমাত্র। এইগুলি থাকলেই রবীন্দ্রসঙ্গীতকে রবীন্দ্রনাথের রচিত গান বলে চেনা যায়... প্রত্যেক শ্রদ্ধাশীল শ্রোতাই যেন তা অনুভব করেন। তাঁর গান গাইবার সময় যেন তাতে একটু রস, তান, দরদ, মীড় থাকে।''[১৭]

সঙ্গীতাচার্যের লেখনীতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের নানা প্রশ্নের নিশ্চিত সমধান রয়েছে। এই গ্রন্থটি রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক আলোচনা-সমালোচনা ও গবেষণায় অপরিসীম তাৎপর্য বহন করে আছে, এ কথা একালের বিশিষ্ট গবেষকেরাও মনে করেন।

।। নয়।।

প্রসাদ সেন-এর 'রবীন্দ্রসঙ্গীতে মিলনমেলা' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে। সংগৃহীত গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ২০০৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। এই গ্রন্থের 'ভূমিকা' এবং 'পরিচয়' অংশের লেখনী দুটি

যথাক্রমে শৈলজারঞ্জন মজুমদার ও অমিতা ঠাকুরের। গ্রন্থটিতে মোট ছয়টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ও শিক্ষক প্রসাদ সেন। বিষয়গুলি হল—রবীন্দ্রসঙ্গীতে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রভাব, রবীন্দ্রসঙ্গীতে বাউল গানের প্রভাব, রবীন্দ্রসঙ্গীতে কীর্তনের প্রভাব, রবীন্দ্র রচনায় পদাবলী সাহিত্যের প্রভাব, রবীন্দ্রসঙ্গীতে ভারতীয় প্রাদেশিক সঙ্গীতের প্রভাব, রবীন্দ্রসঙ্গীতে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রভাব।

গ্রন্থে উল্লিখিত অধ্যায়ের বিষয়বস্তু নিয়ে সাম্প্রতিক কালের অনেক পূর্বেই রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক নানামুখী আলোচনায় বিষয়গুলি নিয়ে খুঁটিনাটী বিশ্লেষণ হয়েছে। তবে শ্রী সেনকে ধন্যবাদ দিতে হবে পুণরায় বিষয়গুলিকে সম্পূর্ণভাবে সাজিয়ে বিশদে উপস্থাপন করার জন্য। গ্রন্থে রবীন্দ্রসঙ্গীতে শাস্ত্রীয়, লোকায়িত, প্রাদেশিক, পাশ্চাত্য ধারার সুর ও আংগিকের যুক্ত হওয়া বা মিলনের কথাই বলা হয়েছে। নানা ধরনের সুরের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সৃষ্টিতে যে প্রেরণা যুগিয়েছে তা-ই এই গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কীভাবে মূল থেকে ভেঙে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে তাঁর সঙ্গীত সৃষ্টিকে অনুপম করে তুলেছেন লেখক তা-ই তুলে ধরেছেন উদাহরণ সহযোগে প্রতিটি অধ্যায়ের আলোচনাতে। লেখক শাস্ত্রীয় সঙ্গীত প্রভাবিত রবীন্দ্রসঙ্গীতকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করেছেন—হিন্দী ভাঙা গান আর হিন্দুস্থানী রাগরাগিনী সমৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় রচনা। হিন্দী ভাঙা গানে কখনো সরাসরি অনুসরণ, আবার কখনো বা স্বতন্ত্র দিকনির্দেশ করা হয়েছে, যা দীর্ঘ তালিকা দিয়ে লেখক বুঝিয়ে দিয়েছেন।

স্বকীয় রচনায় পাওয়া যায় প্রচলিত রাগরাগিনীর প্রয়োগের নতুনত্ব। এই নতুনত্ব শুধু সুরের বেলায়ই নয়, গীতি অবয়বেও লক্ষ্য করেন লেখক। শাস্ত্রীয় ধারার নানা অঙ্গের গানের উদাহরণে লেখক বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন। লেখকের মতে বাংলা লোকসঙ্গীতের, মূলত বাউল, ভাটিয়ালী, সারি গানের প্রভাবই রয়েছে রবীন্দ্রসঙ্গীতে—তবে বাউল এর প্রাধান্যই বেশি। লেখকের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে

যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে কেবল বাউলের সুরই গ্রহণ করেননি, অনেক ক্ষেত্রে বাউল গানে প্রচলিত বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ শব্দও গ্রহণ করেছেন, গ্রহণ করেছেন বাউলের দর্শণও। কীর্তনের প্রভাব নিয়ে তাঁর অভিমত উল্লেখযোগ্য,

> ''রবীন্দ্রনাথের ভাব নিজেকে প্রকাশ করেছে কীর্তনের রসে সিক্ত হয়ে কীর্তন আঙ্গিককে অবলম্বন করে।''[১৯]

এই উক্তির যথার্থতা রবীন্দ্রনাথের নানা পর্যায়ের গান খুঁজলেই ধরা পড়ে। লেখকও নানা পর্যায়ের গানের উদাহরণ দিয়ে এর বিভিন্ন দিক নিয়ে যুক্তিনিষ্ঠ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। তাছাড়া এই পর্বে কীর্তনের ভাষার প্রয়োগও রবীন্দ্রনাথের গানে কীভাবে ধরা পড়েছে তা দক্ষতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করে পাঠককে ঋদ্ধ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গানে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব নিয়ে লেখক তাঁর সুতীক্ষ্ণ মতামত তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে প্রত্যক্ষ প্রভাব রূপে 'ভানুসিংহের পদাবলী' রবীন্দ্র কাব্যের অন্যতম ফসল। কিন্তু এও তো ঠিক এখানেও ভাষা আর আঙ্গিকে নিজস্বতা রয়েছে—যা কবিই বলে গেছেন। লেখক পদাবলীর পরোক্ষ প্রভাবে রচিত রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে অল্প কয়টি উদাহরণ দিয়েছেন। যদিও বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাবে রচনার উদাহরণ গীতবিতানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে একেবারে কম নেই। রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রাদেশিক গানের প্রভাবের ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুদিকই রয়েছে বলে লেখক মনে করেন। আর পাশ্চাত্য সঙ্গীতের লয় ও ছন্দের প্রভাব রবীন্দ্রসঙ্গীতে রয়েছে বলেও তিনি তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। পাশ্চাত্য সুর ভাঙা গান ছাড়াও শ্রী সেন কিছু কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীতে পাশ্চাত্য বিন্যাস, সুরসঙ্গতি খুঁজে পান। আসলে এ পাওয়াই তো স্বাভাবিক। কারণ রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব থেকে আহরণ করে আপন সৃষ্টিশক্তির গুণে যে অনুপম শিল্প বিশ্বকে উপহার দিয়েছেন তা তো অসংখ্য খণ্ডের অখণ্ড প্রকাশ 'রবীন্দ্রসঙ্গীত'। আসলে রবীন্দ্রনাথ যে ধারা, যে আঙ্গিক থেকেই উপাদান

আহরণ করে নতুন সৃষ্টি করেছেন, সেই সৃষ্টিই চূড়ান্ত কথা। রবীন্দ্রসঙ্গীতের উপাদান, সৃষ্টি রহস্য জানতে গিয়ে নানা সুরের প্রভাবের কথা আমাদের জানতে হয়, তাই জানি। কিন্তু মানি শুধু 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' কে। বিশিষ্ট শিল্পী শিক্ষক, শান্তিনিকেতনের ধারায় শিক্ষিত প্রসাদ সেনের গ্রন্থটি রবীন্দ্রসঙ্গীতে নানা আঙ্গিক, সুরের প্রভাব নিয়ে আলোচনায় সমৃদ্ধ।

সূত্রনির্দেশ—

১। সন্‌জিদা খাতুন, রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাবসম্পদ, অবসর, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০০৮, পৃঃ-১৮।

২। কিরণশশী দে, রবীন্দ্রসঙ্গীত ঙ্খ রবীন্দ্রনাথ ঙ্খ শিক্ষক দিনেন্দ্রনাথ, দে'জ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০০, পৃঃ-৩৯।

৩। তদেব, পৃঃ-৪১-৪৩।

৪। সুচিত্রা মিত্র, রবীন্দ্রসঙ্গীত জিজ্ঞাসা, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৮৬, পৃঃ-১৮।

৫। তদেব, পৃঃ-২১-৩১।

৬। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, আলো আঁধারের সেতু, (রবীন্দ্র চিত্রকল্প), দে'জ, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪, পৃঃ-১৫৭।

৭। জয়ন্তী ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গান, করুণা, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃঃ-২০০-২০৪-২১৭।

৮। শৈলজারঞ্জন মজুমদার, যাত্রাপথের আনন্দগান, আনন্দ, কলকাতা, মে ২০১১, পৃঃ-৪৫-৪৯-৫১-৬১।

৯। তদেব, পৃঃ-৯০-৯১-৯২।

১০। তদেব, পৃঃ-১০৮-১১০।

১১। কালিদাস নাগ, সুরের গুরু রবীন্দ্রনাথ ও গুরুদেবের পত্রাবলী, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃঃ-৪২।

১২। তদেব, পৃঃ-৯৭-৯৮।

১৩। দেবজ্যোতি দত্ত মজুমদার, রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃঃ-৪২।

১৪। তদেব, পৃঃ-৪৩।

১৫। তদেব, পৃঃ-৮৫-৮৭।

১৬। তদেব, পৃঃ-১১৭-১১৮।

১৭। শৈলজারঞ্জন মজুমদার, রবীন্দ্রসঙ্গীত চিন্তা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃঃ-।

১৮। তদেব, পৃঃ-৯২।

১৯। প্রসাদ সেন, রবীন্দ্রসঙ্গীতে মিলন মেলা, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৩, পৃঃ-৬৮।